ড. মোঃ সবুর খানের সফল উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার গল্প

হাকিম মোড়ল

ড. মোঃ সবুর খান বাংলাদেশের একজন সফল উদ্যোক্তা। তিনি দেশের প্রথম পাবিলিক লিস্টেড তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানী ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স লিমিটেড তথা আজকের ড্যাফোডিল পরিবার এবং শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। সফল উদ্যোক্তার পাশাপাশি তিনি ট্রেড সংগঠনেরও নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ও ঢাকা চেম্বার অব কর্মাস ও ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। তাছাড়া তিনি ওয়ার্ল্ড আইটি সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন (ডওঞঝঅ) এর পরিচালক এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড কমিটি এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এ্যাসোসিয়েশন পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

অব ইউনিভার্সিটিজ অব এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক (অটঅচ) এর বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ২০২৩-২৪ মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন এবং তিনি ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্টস এর একজন সদস্য হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি তিনি ওয়ার্ল্ড বিজনেস এঞ্জেল ইনভেস্টমেন্ট ফোরামের বাংলাদেশের হাই কমিশনারহিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিভিন্ন ঘাত প্রতি ঘাতের মধ্যদিয়ে নব উদ্যমে কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছেন তিনি ।

উদ্যোক্তা পত্রিকার সঙ্গে কথা হয় এই সফল ব্যবসায়ীর। তিনি বলেন-করোনা আমাদের লাইফ স্টাইলটা বদলে দিয়ে গেছে। আমরা যারা ব্যবসা করি, সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকেও যদি লক্ষ্য করি দেখব, আমরা যেখানে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি বাংলাদেশে ভার্চুয়াল কোর্ট বসবে। সেখানে সরকার অধ্যাদেশ জারি করে ভার্চুয়াল কোর্ট বসাতে বাধ্য হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা এই ইন্ডিকেশন পাচ্ছি যে, সর্বত্র বড় ধরনের পরিবর্তন হয়ে গেছে।

ড. মোঃ সবুর খান বাংলাদেশের একজন ব্যবসায়ী। তিনি ২০০২-২০০৩ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১২ সালের ২৯ ডিসেম্বর ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র (ডিসিসিআই) সভাপতির দায়িত্ব পান তিনি । তিনি ৯০ দশক থেকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবসায়ী হিসেবে ব্যবসা শুরু করেন। শুরু থেকেই গতানুগতিক ধারার বাইরে ইনোভেটিভ চিন্তা ভাবনায় অভ্যস্ত সবুর খান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়েই ব্যাবসায় করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেভাবেই নেটওয়ার্ক মেইনটেইন করতে থাকেন ও নিজেকে মানুষিকভাবে প্রস্তুত করেন।

মোঃ সবুর খানের জন্ম পদ্মা-মেঘনা-ডাকাতিয়ার মিলনস্থল ইলিশের বাড়ী খ্যাত চাঁদপুর জেলা শহরের বাবুরহাটে ১৯৬৫ সালে। চাঁদপুরেই সম্পন্ন করেন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও এইচএসসি এবং তারপর ভর্তি হন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে। জাহাঙ্গীরনগরে পড়াকালীন সময় তিনি রোটার‍্যাক্ট, স্কাউটসহ নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হন।

পড়াশোনা শেষে যখন বাংলাদেশের অধিকাংশ তরুণ চাকরির পেছনে ছুটে বেড়ায়, সে প্রেক্ষাপটে নিজেকে ব্যবসায় জড়িত করেন ড. সবুর খান । তারপর আর খুব একটা পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। ১৯৯০ সালে ব্যবসা শুরু করার পর ১৯৯২ সালে ড্যাফোডিল ডেস্কটপ পাবলিশিং সেন্টারকে বড় আকার দেন। সিঙ্গাপুর থেকে আমদানীকৃত যন্ত্রাংশ দিয়ে তিনি সিডিকম ক্লোন পিসি অ্যাসেম্বলিং করে বাজারজাত শুরু করেন ১৯৯৩ সালে। তথ্যপ্রযুক্তির ভবিষ্যত বিস্তৃতি ও দ্রুত কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে ঢাকায় বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার সুপার স্টোর গড়ে তোলেন সবুর খান।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেই ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পরেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স, যা বর্তমানে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। ড. খান তার দীর্ঘ ও সফল ব্যবসায়িক জীবনে একে একে প্রতিষ্ঠা করেন ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অব আইটি (ডিআইআইটি), ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বাংলাদেশ স্কিল ডেভেলাপমেন্ট ইন্সটিটিউট, ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ড্যাফোডিল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, আমার ফার্মা, ড্যাফোডিল জাপান আইটি লিমিটেড, ইমিনেন্স কলেজ, কলেজ অব হিউম্যান ডেভেলাপমেন্ট, নিউটেক ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, দেশের প্রথম জব পোর্টাল জবসবিডি, ডলফিন কম্পিউটার্স লিমিটেড, ড্যাপোডিল ওয়েব এন্ড ই- কমার্স ও ড্যাফোডিল অনলাইন লিমিটেডসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে শিক্ষা, আইসিটি, স্বাস্থ্য ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন এই চারটি সেক্টরে ড্যাফোডিলের সবমিলিয়ে মোট ৪০ টিরও অধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সবুর খান গড়ে তুলেন ড্যাফোডিল ফাউন্ডেশন।

উল্লেখ্য, ড. মোঃ সবুর খান ২০০৪-২০০৬ মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ২০০২-২০০৩ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য-প্রযুক্তি টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই সঙ্গে ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্টস ফোরামসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

শিক্ষা, কর্মসংস্থান, মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম, কর্পোরেট সোশ্যাল রেস্পন্সিবিলিটি এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্যে ইতোমধ্যে ড. মোঃ সবুর খান স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বহু পুরস্কারে ও সম্মাননায় ভূষিত হন। এদের মধ্যে "ঞযব উধরষু ঝঃধৎ ওঈঞ ইঁংরহবংং চবৎংড়হ ড়ভ ঃযব ুবধৎ ২০১৮" পুরস্কার, "খরমযঃ ড়ভ অংরধ অধিৎফ" পুরস্কার, "এষড়নধষ ওহপষঁংরড়হ" পুরস্কার "ডড়ৎষফ ঈড়হমৎবংং ড়ভ ওঞ (ডঈওঞ) ২০১৭ গবৎরঃ" পুরস্কার "অংরধ'ং সড়ংঃ রহংঢ়রৎরহম ঘধঃরড়হ ইঁরষফবৎ" পুরস্কার উল্লেখ্য।

একজন রিসোর্স পার্সন হিসেবে ২৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে ড. মো. সবুর খান দেশি ও বিদেশি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার ও টক শোতে অংশগ্রহণ করে আসছেন। উদ্যোক্তা উন্নয়নে তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন নির্দেশিকা', 'আর্ট অব ইফেক্টিভ লিভিং' এবং 'এ জার্নি টুওয়ার্ডস এন্ট্রাপ্রেনারশিপ' নামে বই লিখেছেন।

'আর্ট অব লিভিং' এবং 'চেঞ্জ টুগেদার' ধারনার পথিকৃৎ উদ্ভাবক হিসেবে ড. মো. সবুর খান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কর্ধভভসধহ ঋড়ঁহফধঃরড়হ, এষড়নধষ উহঃৎবঢ়ৎবহবঁৎংযরঢ় ঘবঃড়িৎশ (এউঘ), ঈযরষফ ্ গড়ঃযবৎ ঝরহধহপব ওহঃবৎহধঃরড়হধষ (ঈগঝও)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা তাঁকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতি এনে দিয়েছে।

তিনি বলেন, একইভাবে যদি ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলি, আমি ৩১ বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম ব্যবসা কত বেশি অটোমেশন করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে, খধপশ ড়ভ চৎড়ভবংংরড়হধষরংস কথা বলি, খধপশ ড়ভ ঈড়সসরঃসবহঃ ' কথা বলি বা আমাদের সংস্কৃতির কারণে বলি আমি তা করতে পারছিলাম না। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইমপ্লিমিন্টে করতে পারিনি। এখন আমি সেটা সাকসেসফুলি করতে পেরেছি। এই যে একটি সল্যুশন হয়ে গেল। আগে আমাদের ব্যবসায়ীদের একটি মানসিকতা ছিল অফিসটি কত সুন্দর হবে, কত বড় হবে। একটি ওয়েটিং লাউঞ্জ থাকবে। একটি কনফারেন্স রুম থাকবে। যাতে আমরা অফিসে এসে সবাই প্রিজড হয়ে যাই, কত সুন্দর অফিস। আমরা কি কখনো কল্পনা করেছিলাম চাল, ডাল, সবজি অনলাইনে বিক্রি করা হবে। যদি করোনার পাঁচ বছর আগের কথা বলি, এমনটা কল্পনাও করতে পারিনি। কিন্তু এখন তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আমি আমার বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি তরিতরকারি, পানি পৌঁছে দিচ্ছে। যারা মাস্ক বা স্বাস্থ্য সামগ্রী ব্যবহার করছে তাদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। সবধরনের ব্যবসায় ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। ব্যবসায়ী হিসেবে আমরা এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমি প্রথম এক মাস খুব বিব্রত হয়েছি। তিলে তিলে গড়া ওঠা প্রতিষ্ঠান সমস্যায় পড়বে? আমার একটি প্রতিষ্ঠানের বেতন সাত কোটি টাকা। আমার ৪০টি প্রতিষ্ঠান, তাহলে এক মাসের মধ্যে ব্যাংক-ক্রাফট হয়ে যাব। কিন্তু যেখানে আমি টেকনোলজি জানি, টেকনোলজির সুযোগ জানি। ঠান্ডা মাথায় ভাবলাম প্রযুক্তি কীভাবে সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ব্যবসা চালু করা যায়, প্রতিস্থাপন করা যায়। তারপর প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেগুলো চালু করলাম।

এখন বিনিয়োগের ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। এখনকার বিনিয়োগ পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিজনিত বিনিয়োগের সুযোগ। এখনকার বিনিয়োগ বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর। বিনিয়োগে ডাইভার্সিটি এসেছে। এখন কিন্তু প্রযুক্তিতে, স্বাস্থ্য খাতে অনেক কোম্পানি বিনিয়োগ করছে। বাইরে থেকেও বিনিয়োগ আসছে। আমি নিজেও প্রস্তাব পাচ্ছি। এটা কেন হচ্ছে, পরিবর্তিত চাহিদানির্ভর সেবা দিতে তারা নিজেদের প্রস্তুত করছে। করোনাকালে ব্যাংক খাতের কোনো সমস্যা হয়নি। তারা অনায়াসে লেনদেন করেছেন। কোনোই সমস্যা হয়নি। কারণ তারা আগে থেকেই প্রযুক্তির ব্যবহার করছিল। মোবাইল ফাইন্যান্সিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আপনি লক্ষ্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন দিতে নগদকে বেছে নিয়েছেন। এটা একটি গুড আইডিয়া। কারণ হলো ওই শিক্ষককে আর ব্যাংকে যেতে হবে না। বেতন আনার জন্য তাকে আর আগের দিন থেকে প্রস্তুতি নেওয়া লাগবে না। সকালে উঠে মোবাইলে একটি ম্যাসেজ আসবে- তিনি বেতন পেয়ে গেছেন। আমি বলব, করোনাকালে সরকারি সহায়তা দেওয়ার জন্য মোবাইল ব্যাংকিংয়ে সফলতার জন্য আজ এই পথে আসতে হলো। শুরু থেকে যারা প্রযুক্তি ব্যবহার করেনি তারা একটু সমস্যায় পড়েছে।

ফিজিক্যাল আসা লাগবে সে ধরনের বিনিয়োগ আসছে না। প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে সব বিনিয়োগ সম্ভব সে সব বিনিয়োগ আনছে। আগে ফিজিক্যাল যাওয়া লাগত, তখন সে ধরনের বিনিয়োগ হতো এখন আর সে ধরনের বিনিয়োগ হচ্ছে না। যেমন ধরেন ভারতে বিখ্যাত পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৬০০ একাডেমিসিয়ান অংশগ্রহণ করল। সেখানে মন্ত্রী এলেন, বিশেষজ্ঞরা এলেন। আমি মনে করি শারীরিক উপস্থিতির মাধ্যমে এ ধরনের কনফারেন্স যে ইম্প্যাক্ট হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করেছে এই সম্মেলন। কারণ হলো, সম্মেলনের রেকর্ড থাকছে, বেশিসংখ্যক মানুষের উপস্থিতি থাকছে, প্রপার টাইমিং থাকছে, সবাই দেখতে পারছে। এই যে পরিবর্তনটা, প্রযুক্তির এই যে ব্যবহার এই সুযোগ যারা নিতে পেরেছেন তারা প্রকৃতপক্ষে সফল হয়েছেন। কিন্তু যেমন রাস্তা-ঘাট, ভবন-কনস্ট্রাকশন এই ধরনের বিষয় যেখানে আছে সেখানে কাজ করা যাচ্ছে না। আমরা এ ধরনের যে সব কাজ আছে সেগুলো করতে পারছি না। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ কম হচ্ছে। আমরা প্রাইভেট সেক্টর, আমরা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি। সেখানে সরকারি বা আন্তর্জাতিক যে বিনিয়োগ সেখানে একটু সময় নেবে।

শিক্ষা খাতে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কাজ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সর্বশেষ মানুষের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হয়নি। ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। আপনি লক্ষ্য করবেন অনেকে ট্রল করত, এখনো অনেকে ট্রল করছে, মনোপুত হয়নি। কিন্তু যারা শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক বিনিয়োগ করেছে, এখনো বিনিয়োগ করছে সার্ভার লোকেশন, ক্লাউডিং, নানা রকম অপরচুনিটি নিয়ে অনলাইনে যে সব ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি, স্টুডেন্টদের মতামত হলো ফিজিক্যাল ক্লাসের চেয়ে অনলাইন ক্লাসগুলোর মজাটা অনেক বেশি ছিল, ইন্টারেকটিভ ছিল। কিন্তু ডেফিনেটলি ফিজিক্যাল তো ফিজিক্যাল- এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই জন্য বলছিলাম যে, ফিজিক্যাল অনেক রিস্ক ফ্যাক্টর ইনভলব থাকে। আমাকে ইউনিভার্সিটিতে আসতে হবে, ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে হবে, আমাকে রাস্তার ট্রাফিক ফেস করতে হবে। পয়সার ফ্যাক্টরগুলো আছে, এই জায়গাগুলো যদি আমরা বাদ দিই- তাহলে সেক্ষেত্রে অনলাইনে অনেকগুলো টুলস ব্যবহার করতে হচ্ছে।

যেমন একজন শিক্ষক সরাসরি ছাত্রের সঙ্গে সরাসরি ইন্টারেকটিভ কোশ্চেন অ্যান্ড আনসার করে রিয়েলি তার শিক্ষাটা হলো কি-না- তার পালস রিয়ালাইজ করতে পারে এবং তার প্রবলেমটা এড্রেস করতে পারে। আমাদের ক্লাসে লক্ষ্য করা গেছে- দেড় ঘণ্টার ক্লাসে ছাত্ররা এক সেকেন্ডের জন্য বের হয়ে যায়নি। কারণ সে মনে করেছে বের হয়ে গেলে বিভিন্ন রকম যেসব অ্যাসেসমেন্ট আছে সেগুলো পাস করতে পারব না। সুতরাং নিজের স্বার্থেই সে মনোযোগী ছিল। এই ফোকাস ছিল এ জন্য একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে হয়েছে। এটাকে আমরা বলি আর্টিফিসিয়ালি ইন্টেলিজেন্ট। যদি ক্লাস থেকে চলে যায় সফ্টওয়্যার বলে দেবে ও কিন্তু নেই। আমরা এমন সিস্টেমও ডেভেলপ করেছি। কোনো ছাত্র যদি ঘাড় ফেরায়ও সিস্টেম বলে দেবে সে আরেক দিকে তাকাচ্ছে বা সে কপি করছে। এগুলো কিন্তু আমরা আগে ডেভেলপ করতে পারিনি। এ জন্য আমরা বলছি শিক্ষা ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে।

একটি জুম সফটওয়্যার, মার্কেটে যার কোনো ভেলুই ছিল না। এখন সারা বিশ্বে আইটিকে নাম্বার ওয়ান জায়ান্ট কোম্পানি হয়ে গেছে। বিশ্বের বড় বড় কোম্পানিকে বিট করছে। কেন এটা হলো, কারণ হলো তারা নিত্যনতুন ফিচার যোগ করছে, পরিবর্তিত সময়ের চাহিদা পূরণ করছে। বলা হচ্ছে, সারা বিশ্বে সব এয়ারলাইন্স যে ব্যবসা করতে পারেনি এক জুম তার চেয়ে বেশি ব্যবসা করেছে।

আন্তর্জাতিকভাবে আমরা এখনো অত ভালো না। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এখন আমাদের সময় আসছে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে প্রমাণ করার। আগে আমরা এই প্রমাণের সুযোগ পাইনি। লক্ষ্য করবেন আন্তর্জাতিকভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের ছেলে-মেয়েরা যাচ্ছে। তাদের ভালো ভালো প্রডাক্ট, ভালো ভালো সলিউশন তারা করছে। এগুলো তারাও যেমন ব্যবহার করছে, বাইরেও ব্যবহার করছে। এই পেন্ডামিক, এটাও একটি সুযোগ করে দিল।

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় পাস করে এসে ব্যবসা শুরু করি, তখন কিন্তু এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ বা উদ্যোক্তাবৃত্তি বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম হতো না। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এসব নিয়ে প্রচুর পরিমান এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিজ পরিচালিত হচ্ছে যা নতুন প্রজন্মের জন্য

এখন ইয়ং যারা তারা নতুন নতুন চিন্তা করছে। নতুন কিছু শিখছে। আমার ছেলে-মেয়েরা সবাই (২ মেয়ে -১ ছেলে) সবাই ইউনিভার্সিটির লেখাপড়া শেষ করে আমার প্রতিষ্ঠানে কাজ করা শুরু করেছে,আস্তে আস্তে আমার প্রতিষ্ঠানসমূহে যুক্ত হচ্ছে তাদেও চিন্তা-চেতনা অনেক সময় আমার চেয়েও বেটার হ্চ্ছে। আমার সন্তানরা ক্ষেত্র বিশেষে আমাকে গাইড করছে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে সাইক্লোজিক্যাল বা লজিক্যাল বিষয়ে কম্পিটিশনে আমি অনেক সময় পেরে উঠি না। তার মানে আজকের প্রজন্ম আমার চেয়ে অনেক ফার্স্ট। তাই আমি সবসময় একটা কথা বলে থাকি এবং মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে প্রযুক্তির সাথে প্রজন্মের একা গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো নতুন প্রজন্মের সামনে জানা এবং সৃষ্টির দ্বার অবারিত। আর আমরা হাজারো চিন্তা হাজারো কাজ নিয়ে দিন পার করতে হয়। আর তরুণ প্রজন্ম পরিবর্তীত দুনিয়াকে প্রতি মুহূর্তে নতুনভাবে আবিষ্কার করছে। নতুন প্রযুক্তিগত যেমন ডেভেলপড সেটা গ্রহণও করছে খুব সহজে। এ জন্য আমাদের তরুণ প্রজন্মের কাছে সুযোগ গ্লোবালি নিজেদের তুলে ধরার। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমরা আমাদের পুরো রিসোর্স কাজে লাগাতে পারব ইনশাআল্লাহ।

রাজনীতি এখন পুরানা পল্টন বা মাঠ থেকে চলে আসছে প্রযুক্তিতে। আমাদের রাজনীতিক নেতা নেত্রীরা মাঠের রাজনীতিতে আগের মতো ওইভাবে আর লোক পাবে না। তারা তাদের জনপ্রিয়তা এখন প্রুফ করতে পারবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এখন রাজনীতিকের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করেন ফেসবুক পেজে তার ফলোয়ার কত, গুগলে তার ফলোয়ার কত, টুইটারে তার ফলোয়ার কত এর ভিত্তিতে।

এই যে ধারাটা, ছাত্র রাজনীতির কলুষিত ধারা শুরু হয়ে গেল। আমরা সেটা থেকে বের হয়ে আসতে পারি না। এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে একটি ভালো উপায় হলো প্রযুক্তির ব্যবহার। এখন দাবি আদায় করার জন্য যে মাঠে নামতে হবে- এটাও মনে করি না। আমার মনে হয় এবারের আইনটা মাঠে না নেমেও সংশোধন করা সম্ভব ছিল। আপনি লক্ষ করুন একজন রাজনীতিক যদি ভালো কথা বলেন, যদি মানুষের কথা বলেন, মানুষ যদি অনুধাবন করে মানুষ তার পেছনে হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো লাইন ধরে। এখন একজন মানুষ যদি সরকার বা সরকারের যদি হুমকি হয়ে ওঠে সরকার পাল্টা টেকনোলজি ব্যবহার করে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। তার মানে এখানেও টেকনোলজির ব্যবহার হচ্ছে।

করোনা মোকাবেলায় সরকার জান-প্রাণ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। যে যতই সমালোচনা করুক না কেন, প্রধানমন্ত্রীর কথাই বলি করোনা মোকাবেলার কথা বলছেন। করোনা মোকাবেলার জন্য নানা রকম বরাদ্দের কথা বলছেন। যারা বাস্তবায়ন করবে তারা যদি দুর্বলতার কাজগুলো করে তাহলে সেটা কীভাবে সমাধান করবেন! সমস্যা হচ্ছে সুশাসনের। সুশাসন নিশ্চিত করতে না পারার কারণে সমস্যাটি থেকেই যাচ্ছে। যারা প্রাপ্য, যাদের প্রয়োজন সেখানে সরকারের প্রণোদনা পুরোপুরি যাচ্ছে না। প্রণোদনার জন্য যে কোন দল করে কোন মতাদর্শেরÑ এ বিষয়গুলো বাদ দিয়ে যার প্রয়োজন, যেখানে প্রয়োজন সেখানে দিলে কাজে লাগবে। আমার মনে হয় সরকারের উচিত এ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করলে মোকাবেলার জন্য যে সব উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে পুরোপুরি রেজাল্ট বের করে আনা সম্ভব।

কোভিড-১৯-এ যে ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেল আমাদের আরও মানবিক হতে হবে। স্বাস্থ্য খাতের উপেক্ষিত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিপুলসংখ্যক মানুষের মধ্যে শক্ত ইমিউনিটি সৃষ্টি হয়ে গেছে।

আমার মনে হয় সরকারকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন ফুড পয়জনিং না হয়, ফুড অল্টারিং না হয়, খাদ্যে কেমিক্যালগুলো যেন ব্যবহার না করে- সেগুলো নিশ্চিত করতে হবে। যার ইমিউন সিস্টেম দুর্বল করোনা তাকে অ্যাটাক করছে। যারা মারা যাচ্ছে তারা কারা- তারা যাদের শরীরের কোনো একটা অংশ আগে থেকেই কলাপস্ হয়ে আছে তারা জানেই না। আমার মনে হয় সরকারকে এগুলোতে নজর দিতে হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দেশসেরা:
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ র‍্যাংকিং হিসেবে স্বীকৃত টাইমস হায়ার এডুকেশন ইমপ্যাক্ট র‍্যাংকিং ২০২১- এ বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম অবস্থানে রয়েছে। দেশের ৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং তালিকায় স্থান পেয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি তাদের র‍্যাংকিং এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে। এতে বিশ্বের ৯৪টি দেশ ও অঞ্চলের ১১১৫টি প্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছে। জাতিসংঘ নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ভিত্তিতে এ র‍্যাংকিং করা হয়।

এজন্য চারটি সূচক ব্যবহার করা হয়। সেগুলো হচ্ছে- গবেষণা, স্টিয়ার্ডশিপ, আউটরিচ এবং শিক্ষণ। ইমপ্যাক্ট র‍্যাঙ্কিং ২০২১-এ প্রথমবারের মতো শীর্ষ স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশিত তালিকায় বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অবস্থান ১ম। বিশ্বের ১১১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩০১ থেকে ৪০০ তালিকায় স্থান করে নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯৯২ (২) অনুযায়ী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় ২০০২ সালের ২৪ জানুয়ারি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে আশুলিয়ায় ১০০ একর জায়গার উপর সুবিস্তৃত নয়নাভিরাম সবুজ ক্যাম্পাস শিক্ষার্থীরে দারুনভাবে আকৃষ্ট করছে।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটিস এর সক্রিয় সদস্য।

রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডিতে কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে সমস্ত একাডেমিক কর্মকান্ডই আশুলিয়ায় ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে পরিচালিত হচ্ছে। এতে রয়েছে ক্রিকেট খেলার মাঠ, ছেলে ও মেয়েদের আলাদা হোস্টেল, গলফ খেলার মাঠ, বাস্কেট বল কোর্ট, সুইমিং পুল ও ছয় হাজার শিক্ষার্থী ধারনক্ষমতা সম্পন্ন অডিটোরিয়াম। বলা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ড্যাফোডিলের ক্যাম্পাস সবচেয়ে সুন্দর ও মনোরম। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ৫টি অনুষদ এর অধিনে সর্বমোট ২৪টি বিভাগ রয়েছে এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজারের কাছাকাছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট দূরীকরণে ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটি আশুলিয়ায় ৫টি আবাসিক হল রযেছে।

গুণগত শিক্ষার দিক থেকে এগিয়ে থাকা বিশ্বের ৯৬৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শীর্ষ ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই জ্ঞানার্জনের সংস্কৃতির বিকাশ, শিক্ষার দর্শন এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই তালিকা সেই চেষ্টারই স্বীকৃতি।

June 7, 2022   Ashraful Karim   শিল্প-বাণিজ্য